জম্বুদ্বীপ

দেবব্রত মল্লিক

জেটিতে দাঁড়ানো রয়েছে লঞ্চগুলি। ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে। লঞ্চের মাস্তুলে উড়ছে নানা রঙের পতাকা। চালক আর রয়েছে দু'টো ছেলে। জম্বুদ্বীপ নিয়ে যাবে। যেতে আসতে সময় লাগবে দু'ঘন্টা।

ব্রতীন একটু ভাবল। যাবে কি যাবে না।

বর্ষা বলল, না থাক ছেড়ে দাও।

রিকশা ভ্যানওয়ালা কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। বাবু ঘুরে আসুন। পরে সুযোগ নাও পেতে পারেন।

ব্রতীন দোটানায় পড়ে যায়। এ জায়গাটা যেন ফিশের এলাকা। বিশাল জায়গা। নামখানা থেকে বকখালি যাওয়ার পথে পড়ে। ছোট বড় নানা ধরনের বাড়ি রয়েছে। সাজানো গোছানো। দফতর আছে। আছে মাছ রাখার জায়গা। ভ্যানওয়ালা কয়েকটি বাঁধ ঘুরে জেটি ঘাটে নিয়ে এল। ব্রতীন জানতে চাইল—কত লাগবে?

ভিতরের খোলে গেলে আশি, আর ডেকে চেয়ারে গেলে লাগবে নব্বই টাকা। লঞ্চ এগিয়ে চলেছে। দু'পাড়ে হেতাল আর সুন্দরী গাছের সার। মাঝে মাঝে বনের মধ্যে ফাঁক রয়েছে। পরিস্কার বোঝা যায়, ওখান দিয়ে ছোট সরু নৌকা ভিতরে ঢুকে যায়। একটা জায়গায় খোলা মাঠ। এখানে কোনও বন নেই। মাঠের মধ্যে একরাশ সাদা বক উড়ে এসে এই মাত্র বসল। কিংবা মাথা নিচু করে ঠোকরাচ্ছে। বাঁ দিকে চড়ায় লাল কাঁকড়া। গুটি শুটি দৌড়াচ্ছে, আবার পর মুহূর্তে গর্তে ঢুকে পড়ছে। শয়ে শয়ে কাঁকড়া। যেন কাঁকড়ার মেলা বসে গেছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে দু'দিকের পাড় শেষ। এখন চতুর্দিকে শুধু জল আর জল। লঞ্চ সাগর ছুয়েছে। কিছুটা পথ আরও যাওয়ার পর চালক দূর থেকে দেখাল—এই যে সামনে দেখছেন, এটাই জম্বুদ্বীপ।

লঞ্চে সবার নজর একই দিকে। এখানেও রয়েছে কাঁকড়া। বড় বড়। লঞ্চে দ্বীপের পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এল।

বর্ষা ব্রতীনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, আমরা নামব না এখানে? ব্রতীন ফিসফিস করে জানাল, কেউ তো নামল না দেখছি।

বাঁকা কথা

মনোরঞ্জন ব্যাপারী

বট গাছের গোড়ায় ভিড়। এটা রোজকার ব্যাপার। পাড়ার সব ধরনের লোক আড্ডা জমায় সন্ধ্যেবেলায়। দেশের নানা সমস্যা নিয়ে নানা জন নানা মত দেয়। কথা বলে, আলোচনা করে। আজকের আলোচনার বিষয় কামদুনি। বলছে সবাই—খুব খারাপ।

আলোচনা যখন তুঙ্গে, এসে পৌঁছলেন বাঁকা মোড়ল। মাঝবয়সী মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি চকচকে চোখ, কানে আধপোড়া বিড়ি। এর আসল নাম বিকাশ নায়েক। তবে সে নামে কেউ চেনে না। সব ব্যাপারে আগ বাড়িয়ে কথা বলার জন্য পদবি হয়ে গেছে মোড়ল। আর সব সহজ কথা ভিন্ন অর্থে বাঁকিয়ে দেয় বলে, নাম হয়ে গেছে বাঁকা।

সে এসে হঠাৎ করে আলোচনায় বিঘ্ন ঘটিয়ে ঘোষণা করে, আমি একটা গল্প বলব। আর কারও মতামতের তোয়াক্কা না করে বলতে আরম্ভ করে— একটা লোকের একমাত্র ছেলের ক্যানসার হয়েছে।

লোকজন বিরক্ত, কিসের মধ্যে কি! বলে একজন, এখানে কামদুনি নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে।

আমিও সেই কথা বলছি। গল্প চালিয়ে যায় বাঁকা মোড়ল, তার বাপ সেই ছেলের চিকিৎসার জন্য ভাল ডাক্তার খুঁজছে। খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে পৌঁছল এক ডাক্তারের কাছে। তারপর জানতে চায়— আমার ছেলের যে রোগ, তার চিকিৎসার কীরকম কী খরচ-খরচা হবে, যদি একটা মোটামুটি হিসেব দেন, ভাল হয়।

রোগীকে পরীক্ষা করে বলে ডাক্তার—খুব বেশি নয়, হাজার দশ-বারোতে হয়েই যাবে। ডাক্তারের কথায় বাপ ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারে না। রোগ এত কঠিন, আর চিকিৎসা ব্যয় এত কম! ডাক্তার নিশ্চয় রোগটা ধরতে পারেনি। যে রোগই ধরতে পারেনি, সে চিকিৎসা কী করে করবে?

আবার ছেলের বাপ ডাক্তার খোঁজা শুরু করে। অবশেষে খোঁজ পেয়ে গেল এক বড় ডাক্তারের। সে রোগীকে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষা করে জানাল– খুবই মারাত্মক রোগ। এর চিকিৎসার কত কী ব্যয় হবে, বলা খুবই মুশকিল। আপাতত আপনি এক লাখ জোগাড় করে এনে জমা দিন, চিকিৎসা শুরু হোক, বাকি পরে দেখা যাবে।

ছেলের বাপ তাই করে। ধার দেনা করে জোগাড় করে টাকা। এক লক্ষ থেকে শুরু হয়ে পাঁচ লক্ষে এসে থামে। কয়েক মাস পরে ছেলেটি মারা যায়। ছেলের দাহ সংস্কার সব ক্রিয়াকর্ম মিটে যাওয়ার বেশ কিছুদিন পরে বাপের দেখা হয়ে গেল সেই প্রথম ডাক্তারের সঙ্গে। শোকাতুর বাপের মুখে পুত্রের চিকিৎসা বৃত্তান্ত শুনে ডাক্তার বলে– ছেলেটিকে মেরে ফেলাতে এত টাকা খরচ করে দিলেন! কী বলব আপনাকে? আমি তো এই কাজ মাত্র দশ হাজারে করতে রাজি হয়েছিলাম। আমাকে দিয়ে করালেন না!

আড্ডার লোকজন বোকার মত এ ওর মুখের দিকে তাকায়। একজন বলে– এ গল্প আমরা আগেও শুনেছি।

বলে বাঁকা মোড়ল–আর একবার শুনলে।

–তা এতে কামদুনি কোথায়?

মুখ বেঁকিয়ে বলে বাঁকা– কত কাঠখড় পুড়িয়ে কত কষ্ট করে এই সরকার আনলে! তবে একটা কামদুনি ঘটল। আগের সরকার এর চেয়ে অনেক কম খরচে দশ-বিশ-পঞ্চাশটা এমন ঘটনা ঘটিয়ে দিতে পারত–মরীচঝাঁপি, বানতলা...সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম...গুণে শেষ করা যাবে কত নাম?

কোথাকার গল্প কোথায় শেষ! বটতলার লোকজন বুঝতে পারে না, কী বলতে চাইল বাঁকা মোড়ল।

চিত্রনাট্যশোক

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

মৃত্যুর আগে মানুষটা তাদেরই ছিল, এখন তার দেহটা জনগণের। ছেলেটা নিশ্চুপে দেখছিল বাবাকে অমর রাখার জন্য জন জনতার স্লোগান। অন্তত দুই-আড়াইশ জনতা তাদের ছোট্ট বাড়ি আর নিকানো উঠোনটা ব্যাপ্ত করে রাস্তা অবধি ছড়িয়ে গেছে আর কয়েকজন বিশিষ্ট তার আশে পাশে গম্ভীর এবং ধূমপানরত দু-তিনজন। এত মানুষ এত বিশিষ্টজন তাদের বাড়িতে কখনও আসেনি, আর হয়ত শেষবারের মতো এসেছে। বিধায়ক এসেছিলেন এবং সাংসদ সহ আবার আসবেন মন্ত্রীর সঙ্গে। জনতা ও মিডিয়া অপেক্ষমান তাই। এই জনপদ মন্ত্রীর নিজের ব্লকে আর ভোট প্রচারের কারণে তিনি মহকুমা শহরে সার্কিট হাউসে।

অথচ আজ সকালে নিক্ষিপ্ত বুলেটের লক্ষ ছিল ভিন্ন। হয়ত কেউই ছিল না। আর দশটা ঘটনার মত নিক্ষিপ্ত বুলেটটি হাওয়ায় পড়ে যেত। তার গমনরেখায় বাবার চলে আসাটা ছিল সমাপতন। ছেলেটিও ভেবেছিল তাই-ই। যদিও জনপদ বিশিষ্টরা এই কয়েক ঘন্টায় তাকে বুঝিয়ে ফেলেছে বুলেটের উদ্দেশ্য। দলের এক সম্পাদককে চিরস্তব্ধ করানোর জন্যই যাত্রা করেছিল সেই বুলেট। সুতরাং মিডিয়ার সামনে মন্ত্রী সমীপে ছেলেটিকে যে দৃশ্যে অভিনয় করতে হবে, তার চিত্রনাট্য লেখা হচ্ছিল সন্তর্পণে। সেই সংলাপ ছেলেটিকে একটু পরপর বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন বিশিষ্টগণ। শোকভাঙা কোলাহলের মধ্যেও কান্নার বহুস্বরিক ধ্বনি গৌণ হলেও হারায় না। ছেলেটার কান সেই মিশ্র কান্নার থেকে আলাদা করে নিচ্ছিল মায়ের স্বর, বোনের স্বর, প্রতিবেশী বৌদি কাকিমাদের স্বর।

'তুমি ঠিক আছো তো?' উনি কিন্তু প্রায় চলে এসেছেন। ঝুঁকে পড়ে বললেন একজন। ছেলেটির মনে অসীম শূন্যস্থানে আরও খানিকটা মেঘ ঠাসাঠাসি করে ঢুকে পড়ল। 'যেভাবে বলছি সেভাবে বলবে।' তিনি আবার বললেন। পলকে মেঘ থেকে কিছুটা বজ্র উৎপন্ন হওয়ায় সে চেঁচিয়ে, বলল,'বলব না! আমার বাবাকে নিয়ে আমি যা খুশি বলব না।'

মিডিয়ার কেউ সামনে ছিল না। তার কান্নার ছবি তোলার পর মন্ত্রীর আগমনে শট নেওয়ার স্থান নির্বাচনে ব্যস্ত। বিশিষ্টরা স্বস্তির শ্বাস ফেললেন। কেউ সেই ব্যর্থ বজ্রপাতের শব্দে দূরে থাকা কৌতূহলী পালিত বেড়ালটা মৃদু হেসে উঠে গেল আরও উঁচুতে। সেখান থেকে মন্ত্রীর গাড়ি আসা হবার আগে দেখা যায়।